Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 190 - 194
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রকৃতি ও নারীর একাত্মতা : প্রসঙ্গ তিলোত্তমা মজুমদারের ‘রাজপাট’ উপন্যাস

পলি বাগচী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: bagchipoli@gmail.com

***Received Date** 16. 03. 2024*
***Selection Date** 10. 04. 2024*

Keyword
Environmental feminism, unity of nature and women, conservation of environment, torture and oppression of nature and women, demand for fair rights of women, patriarchy.

Abstract
The title of this research work is – ‘‘Tilottama Majumdar's Novel 'Rajpat' on the Unity of Nature and Women.’’ Tilottama Majumdar can be called a brilliant astrologer in the sky of Bengali fiction. He entered the world of literature by writing stories in 'Unmesh' magazine. In this research work, I have tried to show that in the novel 'Rajpat' he has highlighted the issues of ecofeminism in some contexts. From the beginning of creation of nature, women have experienced nature very closely. I have tried to highlight how the patriarchal society maintains control over women by feminizing nature and naturalizing women. Environmental feminists think that if we look at women and nature from a historical point of view, we will see that the oppression of women and the oppression of nature are tied together. Environmental feminism is a philosophical approach, emphasizing women's rights and protecting the environment, even calling for women to calm nature, protect nature. These various aspects have been specifically tried to be highlighted in this research work.

Discussion

> “হে পৃথিবী, তুমি শান্ত হও, দোলা কমাও। যেন আমরা রক্ষা পাই। আর সকলে বাঁচে।”[১]

- ইয়াম নামের এক জারোয়া যুবতীর প্রার্থনা ছিলো এটি। এভাবেই যুগে যুগে পৃথিবীকে শান্ত করার জন্যে নারীকে আহ্বান করা হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে ইকোফেমিনিজমের। প্রকৃতিকে নারী রূপে, নারীকে প্রকৃতি রূপে কল্পনা করা, যা ইকোফেমিজমের মূল বক্তব্য বিষয়।

আজ থেকে বহুকাল আগের কথা, আনুমানিক সময় আড়াইশো বছরেরও অনেক বেশি যখন মানুষ আন্দোলনের কথা কল্পনাও করতে পারতো না, সেই সময়ে আমাদের এই ভারতবর্ষেই ঘটেছিল এক আশ্চর্য ঘটনা। ঘটনাটির বর্ণনা করা যাক, রাজস্থানের প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে বিষ্ণোই সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামে যোধপুরের রাজার আদেশে কিছু কর্মচারী গ্রামে

এসে সেখানকার কিছু বড় বড় গাছ কেটে ফেলার চেষ্টা করে। অতবছর আগে রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মাথায় পরিবেশ দূষনের কথা ভাবনায় আসা আশ্চর্য বিষয় মনে হলেও তারা জানতেন গাছের মূল্য। জানতেন গাছ তাদের বেঁচে থাকার জন্য কত মূল্যবান। গাছ তাদের খাওয়ায়, পরায়, যোগায় বাসস্থানের উপকরণ, জীবনযাপনের যাবতীয় রসদ তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে গাছ থেকেই। তাই তাদের মনে নিজেদের অজান্তেই গড়ে উঠেছিল গাছের প্রতি ভালোবাসা। অনেক চেষ্টা করেও রাজকর্মচারীদের নিরস্ত্র তারা করতে পারল না। গ্রামের এক একজন মানুষ জড়িয়ে ধরল এক একটি গাছকে ও গাছের সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো তারা। বিষ্ণোই গ্রামে সেদিন রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদে নেমেছিলেন যিনি, শেষ চেষ্টা হিসাবে প্রথম গাছটিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন যিনি গাছের সঙ্গেই প্রাণ দিয়েছিলেন যিনি তিনি একজন সামান্য গৃহবধূ নাম তার অমৃতা দেবী। সেদিনের সেই আত্মবলিদান বিফলে গেলেও অনুপ্রাণিত করেছিল বহু মানুষকে। তার ওই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বহুবছর পর আমাদের দেশে সংঘটিত হয়েছিল- চিপকো আন্দোলন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে চিপকো আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুন্দরলাল বহুগুণা। এই আন্দোলনের ভাবনাটি তাঁর স্ত্রীর ছিল।

১৯৭৩ সালে উওরপ্রদেশের যোগেশ্বর জেলার মান্দল গ্রামে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এক্ষেত্রেও মৌখিক প্রতিবাদ অনুরোধ উপরোধের পর এক একজন গ্রামবাসী জড়িয়ে ধরলেন গাছকে। বহু বছর পার করার কারণে সমাপ্তিটা একটু অন্যরকম হল। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল গাছ কাটতে আসা লোকগুলো। মান্দল গ্রামের আশেপাশের গ্রামগুলিতেও মান্দলের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হল।

> “বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে এক নূতন শাখা ‘পলিউশন’ বা ‘দূষণ’ যুক্ত করার কৃতিত্ব যার তিনিও একজন নারী, নাম-মার্কিন বিজ্ঞানী র‍্যাচেল কারসন।”[২]

আরো কত নারীর নাম পর পর উঠে আসে পরিবেশকে বাঁচাতে। মেধা পাটেকর নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি অনশন ও সত্যাগ্রহের আয়োজন করেছিলেন এবং এর জন্য তিনি বেশ কয়েকবার জেলে গেছেন। নেহেরু গান্ধি পরিবারের পুত্রবধূ মানেকা গান্ধি পরিবেশ মন্ত্রক হিসাবে যুক্ত হন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশবাদী এবং প্রাণী কল্যাণকর্মী।

১৯৭২ সালে ‘ইকোফেমিনিজম’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি নারীবাদী ফ্র্যাঙ্কুইজ দ্য ইয়াবোন্নে। তিনি পুং-ক্ষমতার মুনাফাকেন্দ্রিকতাকে পৃথিবী ধ্বংসের কারণ বলেছিলেন। এরপর ১৯৭৪ সালে তাঁর ‘ফেমিনিজম অর ডেথ’ বইতে প্রথম ‘ইকোফেমিনিজম’ শব্দটা আনুষ্ঠানিক ভাবে পাওয়া গেল। ইকোফেমিনিজমে বিশ্বশান্তি, নারী আন্দোলন ও পরিবেশ রক্ষা এই তিনটি ধারা মিলে গেল। ভারতে চিপকো আন্দোলন কিংবা নর্মদা বাঁচাও প্রকল্প, জার্মানিতে পারমাণবিক প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে কৃষক নারীর উত্থান, জার্মানিতে সবুজ বন্ধনী আন্দোলন– সবকিছুকে এক সুতোয় বেঁধে দিল ইকোফেমিনিজম। এই ইকোফেমিনিজম আন্দোলন এক দিনে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে দীর্ঘ দিনের নারীবাদী এবং পরিবেশবাদী আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলনের দুটি ভিত্তিস্তম্ভ দুটি বইকে বলা যায়। যথা –

১। সমুদ্রজীববিজ্ঞানী র‍্যাচেল কারসনের ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’।
২। ই. এফ. শুমাখারের ‘স্মল ইজ বিউটিফুল’।

পরিবেশ নারীবাদ একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর ন্যায্য অধিকার ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধের কাজে পরিবেশের সংরক্ষণের ওপর জোর দেয়। নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য বিস্তার ও নিপীড়নের বিভিন্ন দিক এবং প্রকৃতির ওপর মানুষের নিপীড়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরাই পরিবেশ-নারীবাদের লক্ষ্য। ক্যারেন জে ওয়ারেন, ভাল প্লাউড, মারে বুকচিন প্রমুখের এ প্রসঙ্গে নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাশ্বতী ঘোষের লেখা ‘নারী ও পরিবেশ : পরিবর্তনকারী না পরিবর্তনের শিকার’ নামক প্রবন্ধ থেকে বলতে পারি সমাজে মেয়েদের অবনমন আর শোষণের সঙ্গে প্রকৃতির দখল আর শোষণের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতির শাসন আর মেয়েদের শাসন যেহেতু এক সঙ্গেই ঘটেছে, তাই প্রকৃতির উপর যন্ত্র সভ্যতার শাসনের অবসানে মেয়েদের বিশেষ স্বার্থ

রয়েছে। মেয়েদের মুক্তির আন্দোলন আর পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন হাতে হাত মিলিয়েই হাঁটে, দুজনেই উঁচু-নিচু ভেদাভেদহীন সমাজের কল্পনা করে, যেখানে কেউ কাউকে শোষণ করেনা। যদিও তা সর্বার্থে সত্যি হয় না।

কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের বেশকিছু উপন্যাসে তিনি প্রকৃতি ও নারীকে একাত্ম করে রূপ দিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর ওপর যেমন অকথ্য অত্যাচার করে আসছে তেমনি প্রকৃতির ওপরও স্বার্থ ও লোভের দ্বারা প্রকৃতিকে করছে ধর্ষিত। একে একে ধ্বংস করছে যেমন অরণ্যের সবুজতা, শ্যামলতা তেমনই নারীকেও ধর্ষণ করে প্রকৃতির বুকেই ফেলে রেখে গেছে নির্দ্বিধায়। নারীর স্বাভাবিক স্বাধীনতা যেমন হরণ করেছে তেমনি অপরদিকে প্রকৃতির নদীর বুকে বাঁধ দিয়ে নিজেদের সুবিধার্থে নদীকে কাজে লাগাতে নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি রোধ করেছে। নদীর অগভীর খাতে বোল্ডার ফেলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে কিছু স্বার্থপর নেতা শ্রেণির মানুষ। ‘রাজপাট’ উপন্যাসে একদিকে ময়না বৈষ্ণবী নারী পাচার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জন আন্দোলন গড়ে তোলেন ও তার ফলস্বরূপ ধর্ষিত হয়ে নৃশংস মৃত্যুকে বরণ করেন।

অপরদিকে নদীতে বোল্ডার ফেলে নদীর গতি রূদ্ধ করার প্রচেষ্টার ফলে নদীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়ে ভয়ংকর বন্যা সূচিত করে। এক্ষেত্রে নারী ও নদী একই সঙ্গে যেন প্রতিবাদ করে ওঠে তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এই উপন্যাসে ময়না বৈষ্ণবী মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আন্দোলন থেমে যায়নি আরো দ্বিগুণ মাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলেছে নারীপাচার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে, তেমনি নদীকেও পোষ মানাতে পারেনি নদী তার বিধ্বংসী রূপ নিয়ে প্রবল বন্যা ডেকে এনে আছড়ে পড়েছে গ্রামগুলির ওপর ও মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে গভীর জলতলে। নদী ক্রমে ক্রমে গ্রাস করেছে সমগ্র জনপদকে। প্রকৃতিকে নিজের অধীনে এনে তাকে অপব্যবহারের যে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাতে না পৃথিবীর কল্যাণ না নারীর কল্যাণ।[৩]

সত্তরের দশকে পৃথিবীর অস্তিত্বের সঙ্গে নারীর অস্তিত্বকে মিলিয়ে এক নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হল যার নাম- ইকোফেমিনিজম। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমিত হয়ে যাওয়া, জঙ্গল সাফ হয়ে যাওয়া, প্রকৃতিক দূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কৃষিকাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। কৃষিকাজে মেয়েদের ভূমিকা লক্ষ্যনীয়- এই প্রসঙ্গ তিলোত্তমা মজুমদার ‘রাজপাট’ উপন্যাসটিতে বর্ণনা করেছেন -

> “...সকলে উলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে নমস্কার করল। এবার লাজের মাথা খাওয়ার পালা।সকল আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকল পুরুষ বিস্মৃত। শুখা, ফসলহীন আবাদি জমিতে এসে দাঁড়াল এয়োতিরা। নিশ্চিদ্র অন্ধকার দেখে সকলে গোল হয়ে দাঁড়াল। সবচেয়ে যুবতি তিন নারী অনাবৃত হয়ে দাঁড়াল খোলা আকাশের তলায়, মানবীর ঘেরাটোপে। একজন শুয়ে পড়ল মাটিতে। চিৎ হয়ে। অন্য দু’জন ভাঁজুই মায়ের ঘটের জল ছিটিয়ে দিতে থাকল তার দেহে। এমনি করে একে একে তিনজনেই ভিজিয়ে ফেলল সর্বাঙ্গ। আকাশ হতে কামাতুর ইন্দ্র দেখলেন এই দৃশ্য। ছিটেফোঁটা মেঘ হয়ে তিনি জমে উঠলেন আকাশে। বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বেন ধরণীতে।”[৪]

বলাই মন্ডলের বাড়িতে মায়া আভূমি প্রণত হয়ে ক্ষেত্রদেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে ব্রতকথা শুরু করে। এগুলি ছাড়াও অসংখ্য ব্রত ছড়িয়ে আছে উপন্যাস জুড়ে সবেতেই প্রকৃতিকে তুষ্ট করে মনষ্কামনা পূর্ণ হবার কথা বলা হয়েছে।

উপন্যাসটিতে নারী জীবনের উপমা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে নদীকে। ঔপন্যাসিকের ভাষাতে–

> “মানবজীবনের মতো, কিংবা যে- কোনও প্রাণীরই জীবনধারার মতো নদীর আছে যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য। যৌবনে নদী খরস্রোতা। প্রৌঢ়ত্বে সে অর্জন করে ভারসাম্য। স্থিত হয়ে বসা সংসারী মানুষের মতোই তার আকৃতি, গর্ভের ঢাল, প্রস্থচ্ছেদ, বাহিত পলিকণা ও স্তরায়িত মৃত্তিকার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য গড়ে তোলে। এই সামঞ্জস্যের মধ্যেই সে তৈরি করে ভারসাম্য। সুগৃহী বা সুগৃহিণী নদ-নদীগণ ভারসাম্য সুন্দর করে রাখেন। তাদের গর্ভে পলির অনুপ্রবেশ এবং নির্গমন চলে ছন্দে ছন্দে। তাঁদের ঢাল থাকে চমৎকার।”[৫]

নদীগর্ভ ও নারীগর্ভকে এক করে এঁকেছেন লেখিকা। তাঁর লেখনীতে–

> “সর্পিল প্রবাহপথ থেকেই তৈরি হয় বেণীবন্ধ প্রবাহ। সর্পিল প্রবাহকালে সমস্ত ভাসমান পলি অপষরণ করতে না পারলে জলস্রোত তা বয়ে নিয়ে যায় নদীগর্ভে এবং গর্ভ ভরাট করে নদীপথের মাঝখানে চরা তৈরি করে।”[৬]

বহু প্রাচীনকাল ধরে চলে আসা প্রথা বৃক্ষকে আশীর্বাদক রূপে পূজা করা, তার কাছে আপন মনস্কামনা পূর্ণ হবার প্রার্থনা জানানো। এই প্রথাটির একটি ইতিবাচক দিকও আছে। এভাবে একটি বৃক্ষকে অনেক বছর বাঁচিয়ে রাখা যায়।

উপন্যাসটিতে শিখারানি নামক এক ওঝা, যিনি ঝাড় ফুঁক করেন, ভুত প্রেত তাড়ান, যার উপর নাকি সতী মা ভর করেন। তারই বাড়ির কাছে সতী মায়ের থান আছে, সেই থানে মেয়েরা পূজো দিতে আসে। এই থানের পাশে অবস্থিত একটি শিউলি ফুলের গাছে মেয়েরা সুতো বেঁধে মানত করে।

এইভাবে মেয়েরা পরোক্ষভাবে গাছটিকে রক্ষা করছে। লেখিকার লেখনীতে –

> “সেই থেকে লোকে সতীরথানে পূজা দিতে আসে। নড়বড়ে মন্দিরের ওপর ঝুঁকে পড়া শিউলি গাছে সুতো বেঁধে দিয়ে যায়। মানত করে।”[৭]

ইঁট-ভাটার ব্যবসা করার জন্য একদল লোভী মানুষ বাঁধের মাটি কেটে নিয়ে যায় তার ফল স্বরূপ বাঁধ দূর্বল হয়ে পড়ে। আলগা মাটি ধুয়ে পড়ে নদীরজলে এবং পলি সঞ্চয়ের অবিশ্রাম ঘটনা ঘটতে থাকে। এভাবে একদল মানুষ নারীর মতন প্রকৃতিকে অধিকার করতে চায়। সর্বগ্রাসী পুরুষ সভ্যতার ধ্বংসেরই সূচনা করে দেয়। প্রকৃতিও তার বিধ্বংসী রূপ নিয়ে এগিয়ে আসে ও মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস করে গ্রামের পর গ্রামকে।

ইকোফেমিনিজম বা মানবী-নিসর্গবাদ একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। যে আন্দোলনে প্রধান ভূমিকায় আছেন পরিবেশবিদরা ও বিভিন্ন স্তরের নারীবাদীরা। এঁদের সঙ্গে নিবিড়– নিসর্গবাদীরাও আছেন। মানবী– নিসর্গবাদীরা মনে করেন নারী নিপীড়নের সঙ্গে প্রকৃতি ধ্বংসের একটা নিবিড় যোগ আছে। যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য নারীদেহের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের একটা সম্পর্ক আছে। মানবসমাজে আমরা যে বর্ণ বিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ, গোষ্ঠীবিদ্বেষ, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য ও অন্যান্য সামাজিক অসাম্য দেখি তারও মূল নারীদেহের ওপর অত্যাচার ও নির্বিচারে প্রাকৃতিকে ধ্বংসের মধ্যে লুকিয়ে আছে। বর্তমানে পুঁজিবাদী সমজের যে বৈভব, যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তা গড়ে উঠেছে মানবী প্রকৃতি ও তৃতীয় দুনিয়াকে শোষণ করে।

নিত্যদিনের জীবনে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রকৃতির ক্ষেত্রেও একই সমার্থক শব্দ বা একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন মেয়েদের সম্মন্ধে ‘ধর্ষণ’ শব্দ যেমন ব্যবহার করা হয় তেমনি জমির ক্ষেত্রে ‘কর্ষণ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়। আবার মেয়েটিকে ‘বাগে’ আনো বা ‘বশে’ আনো। প্রকৃতিকে ‘পোষ’ মানাও। মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে ‘গর্ভসঞ্চার’ জমির ক্ষেত্রে ‘বীজ বোনা’। প্রকৃতিকে কখনো ‘মা’ কখনো বলা হয় ‘দুহিতা’। প্রকৃতির ক্ষেত্রে সবসময়ই স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দের প্রয়োগ যেমন থাকে তেমনি নারী স্বভাব বর্ণনাতেও প্রকৃতির সম্পদ কোনো পাখি বা পশু মানে জীবকূলের স্বভাবের অনুষঙ্গ করে আঁকা হয়।

তিলোত্তমা মজুমদারের এই উপন্যাসটিতে দেখি নারীর চলন বলনের বর্ণনাতে কুবো পাখির মতন চঞ্চলতার প্রসঙ্গকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানেও নারী ও প্রকৃতি মিলে গেছে। বলাই মন্ডলের গম্ভীর মুখ সুমি সহ্য করতে পারে না। বাড়ির কারও বেদনা ভরাতুর মুখ সহ্য হয় না তার। সে চায় সহজ আনন্দ। হাসি-খুশি দিন। যেমন সহজভাবে কুবো পাখি নেচে বেড়ায় আমগাছের ডালে।[৮] আবার কখনও মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন নারীর জল ভরা দুটি চোখের। বর্ষার মেঘের মতোই তাঁর দুই চোখ জলভারানত।[৯] কখনও এর বিপরীত তুলনাও দেখিয়েছেন প্রকৃতির বর্ণনাতে নারী দেহের উপমাকে তুলে ধরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, আষাঢ়ে রোপন করা পরমান্নশালী ধানের শিশু চারাগুলি এ সময় কোমলতনু সবুজ লাবন্যবতী হয়ে ওঠার কথা।[১০]

ইতিহাসের তাত্ত্বিক ধারণা থেকে মনে করা হয় নারীরা আবেগ, দেহ, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে পুরুষেরা যুক্তি, মন, সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই দ্বৈত সম্পর্কে পুরুষের নিচে নারীর অবস্থান। মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত ইকোফেমিনিজমের ধারনাও ঐতিহাসিক ধারনা থেকে গড়ে উঠেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে নারীকে পুরুষের নিচে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং নারীর সঙ্গে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গ লেখিকা ‘রাজপাট’ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন –

> “এরপরে আর কথা বাড়াননি খালেদা। ঘরের পুরুষের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাতেই মঙ্গল। এমনই শিক্ষা তাঁর। মেয়েদের জীবনের কি আর কোনও দাম আছে জীবন হল পুরুষের জন্য। মেয়েরা হল কাজের কাজি। ভোগের বস্তু। সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। মেয়েদের ওপর আর মায়া করে কে। তবু তাঁর বুকের মধ্যে আফসানার

> জন্য দরদ ভরে থাকে। মায়ের মন। তা ছাড়া মেয়েটাও বড় লক্ষী সংসারের জন্য মুখ বুজে প্রাণপাত করেছে। ভরা মাস নিয়ে খেটেছে। পুরুষরা তার কষ্ট কী বুঝবে। মেয়ের কষ্ট মেয়েতেই বোঝে। শাশুড়ি হলে কী হয়!”[১১]

যদিও মেয়েরা যাবার জন্যেই আসে। যতক্ষণ তার গতর থাকে, ততক্ষণ তার কদর থাকে। শাশুড়ি হওয়া সত্ত্বেও এই সকলই বিড়বিড় করে চলে খালেদা। মেয়েরা কাদার ঢেলা স্বরূপ ঝপাস করে জলে ফেলে দেওয়া হয়। শ্বশুরবাড়ি আর জলে ফেলার কোন তফাৎ নেই। জলে ফেলা বলতে প্রকৃতির বুকেই তাকে আছড়ে ফেলাকে বোঝানো হয়েছে।

‘রাজপাট’ উপন্যাসে নারীর শেষ আশ্রয় হিসাবে প্রকৃতিকে বেছে নেওয়ার প্রসঙ্গ সামনে এসেছে। মাত্র পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে একটি নৃশংস হত্যা ঘটায় দুটি পুরুষ। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্কুলের মধ্যে একটি সাধারণদের ও একটি অভিজাতদের। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি স্কুলের হিংসার শিকার হয় ফুলের মতন দশ-বারোটা শিশু। ক্লাসরুম অগ্নিদগ্ধ করে সবকটা বাচ্চাকে পুড়িয়ে মারতে চান দু’জন হিংস্র পুরুষ। তারা একাজে সফল হলেও এর দায় এসে পড়ে নিরপরাধ শিক্ষিকা নিবেদিতার উপর। এই ঘটনায় নিবেদিতা নিশ্চুপ হয়ে গেলেও মানসিক দ্বন্দ্ব তাকে কুরে কুরে খায় প্রতিদিন। কিছুতেই স্বস্তি পাননা নিবেদিতা, অপরাধ না করেও তা কাঁধে বয়ে বেড়ানোর দায় বেশি যন্ত্রণাদায়ক। সমাজের চোখে অপরাধী নিবেদিতা নদীকে শেষ আশ্রয় মনে করে ডুব দেয় নদীর গভীরে ও ক্রমেই তলিয়ে যেতে থাকে। এখানে নিবেদিতা ও প্রকৃতি যেন একই ছন্দে চলতে শুরু করে। নদীমাতৃকা তাকে আঁচল পেতে দেয় আশ্রয়ের জন্য।

কথা সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার উপন্যাসের বর্ণনাতে নারী ও প্রকৃতিকে অভেদ সত্ত্বা রূপে দেখিয়েছেন। ইকোফেমিনিজমের আলোকে নারী ও প্রকৃতিকে এঁকেছেন। সাহিত্যিকের ভাবনাতে নারী ও প্রকৃতি হাতে হাত রেখে এক ভেদাভেদহীন সমাজব্যবস্থার কল্পনা করে। যেখানে পুরুষের সঙ্গে নারীর কোনো অবস্থানগত তফাৎ নেই। উপন্যাস সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে এবং বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বহু সংখ্যক লেখকের লেখা উপন্যাস, গল্প, কবিতাকে ইকোফেমিনিজমের প্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘কপালকুণ্ডলা’তে কপালকুণ্ডলার রূপ বর্ণনাতে, অনুভূতি বর্ণনাতে, আকাঙ্খা বর্ণনাতে বার বার প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন। এই ধরনের টেক্সগুলি ও তিলোত্তমা মজুমদারের ‘রাজপাট’ উপন্যাস বিশেষভাবে ইকোফেমিনিজমের ব্যখ্যা দাবি করে।

Reference:

১. বসাক, তৃষ্ণা, ‘প্রযুক্তি ও নারী’, গা ঙ চি ল, আগস্ট ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৬৭
২. কংসবনিক, রীনা, ‘ঋতবীণা’, পত্রিকা দপ্তর, মুর্শিদাবাদ, পৃ. ৭৮
৩. বসাক, তৃষ্ণা, ‘প্রযুক্তি ও নারী’, গা ঙ চি ল, আগস্ট ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৬৯
৪. মজুমদার, তিলোত্তমা, ‘রাজপাট’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪৫৯
৫. তদেব, পৃ. ১০৫
৬. তদেব, পৃ. ১০৫
৭. তদেব, পৃ. ১৩৫
৮. তদেব, পৃ. ৪৫২
৯. তদেব, পৃ. ৪৬৩
১০. তদেব, পৃ. ৪৭৬
১১. তদেব, পৃ. ৫১৭